২.১৩.৫ হিন্দুস্থানী তাল পদ্ধতি

হিন্দুস্থানী সংগীতের মত হিন্দুস্থানী তালপদ্ধতিও বহু বিবর্তনের মধ্যে বর্তমানের রূপটি পরিগ্রহণ করেছে। এই তাল পদ্ধতি প্রকৃতিতে অভিজাত দেশী। এতে একদিকে যেমন প্রাচীন ভারতীয় দেশী তালপদ্ধতির উপকরণ রয়েছে, তেমনি রয়েছে কিছু আরবীয়-পারসিক উপাদানের মিশ্রণ।

ভারতবর্ষে মুসলিম রাজত্ব দৃঢ় হবার পর থেকে ভারতীয় সংস্কৃতির সর্বস্তরেই পরিবর্তন ও বিবর্তনের জোয়ার বয়ে যায়। এই সময়ে প্রাচীন অভিজাত দেশী গানগুলি বা প্রবন্ধগুলি বিবর্তিত হতে থাকে এবং সেই সংগে নতুন নতুন গীতবন্ধের জন্ম হয়। পেশাদারী দরবারী সংগীতের প্রতি রাজ-আনুকূল্য অকৃপণভাবে বর্ষিত হতে থাকে। সংগীত পবিত্র নাট মন্দির থেকে রাজ-রাজড়া, বাদশাহ্-জমিদারদের দরবারে আশ্রয় নেয়। অধিক প্রচার সম্পন্ন পেশাদারী সংগীতের দ্রুত প্রসার ঘটে মধ্যযুগীয় রাজ আনুকূল্যের কল্যাণে। পেশাদারী সংগীতের মুখ্য লক্ষ্যই হচ্ছে জাতিধর্ম নির্বিশেষে অর্জিত রঞ্জকতা। তা না হলে সংগীতোপজীবীদের জীবনধারণ ও অর্থ উপার্জন কঠিন হয়ে পড়বে।

মুসলিম রাজত্বকালে যখন প্রাচীন প্রবন্ধগুলি দ্রুত বিবর্তিত হয়ে কিছু কিছু নতুন গীতবন্ধের জন্ম হচ্ছিল, সেই সময়ে একই সংগে তালপদ্ধতির কাঠামোও দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছিল। মুসলিম যুগ থেকে ক্রমশঃ একক বাদ্যের প্রাধান্য একটু একটু করে বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। মুঘল যুগে এই প্রাধান্য আরো স্পষ্ট হয়ে যায়। নৃত্য ও যন্ত্রসংগীত পৃথক হয়ে যায়। কণ্ঠসংগীতের ক্ষেত্রে অঙ্গন ভেঙে পৃথক গায়নভংগী বা গীতি প্রাচীন গান্ধর্বযুগে সৃষ্টি হয়েছিল।

বাদ্যযন্ত্রের ক্ষেত্রে শুদ্ধবাদ্যের স্বাতন্ত্র্যকে মান্যতা দানের ফলে মুঘলযুগের মুসলিম পেশাদার তাল বাদকগণ তার ওপর নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেন। উদ্ভব হয় বিচিত্র লয়কারী এবং ছন্দবৈচিত্র্য। মধ্যযুগে এসে মুসলিম প্রভাবে ভারতীয় তালপদ্ধতির বদল পরিবর্তন ঘটে। ভারতীয় গীতরীতির সংগে পারসীক সংগীতের মিশ্রণে এক নব্য গীতবন্ধের উদ্ভব হয়, যাকে আমরা বর্তমানে হিন্দুস্থানী সংগীতরূপে দেখতে পাই। অনুরূপভাবে গীতানুগ, নৃত্যানুগ, স্বয়ানুগ বাদ্যেরও যেমন আকৃতিগত, প্রকৃতিগত পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়, তেমনি ব্যবহারিক দিক থেকেও এই পরিবর্তন লক্ষ্যণীয়ভাবে বিবর্তিত হয়। সেই সংগে উদ্ভব হয় নতুন নতুন পাটকরণ ও বোল প্রয়োগের প্রচেষ্টা। এইভাবে নতুনরূপে নতুনভাবে এক তাল পদ্ধতির জন্ম হয়, নতুন এক তালের ধারা তৈরী হয়ে যায়। নিম্নে বর্তমানে প্রচলিত কয়েকটি তালের পরিচয় তাললিপি সহকারে দেওয়া হল। প্রাচীন তাল পদ্ধতির অনুকরণে সৃষ্টি হল "অঙ্গ"—যেমন ধ্রুপদাঙ্গ, খেয়ালাঙ্গ, ঠুম্‌রী অঙ্গ, টপ্পা অঙ্গ ও লঘু অঙ্গ। বলা বাহুল্য, দশপ্রাণের একটি অঙ্গ হিসাবে একে চিহ্নিত করা যায় না। কেবলমাত্র প্রকৃতিগত পার্থক্যের জন্য একে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। যেমন—

- ধ্রুপদাঙ্গ — চৌতাল, আড়াচৌতাল, ধামার, সুরফাঁক, তেওরা, ঝাঁপতাল ইত্যাদি।
- খেয়ালাঙ্গ — ত্রিতাল, একতাল, আড়াঠেকা, ঝুমরা বা তেওট ইত্যাদি।
- টপ্পাঙ্গ — যৎ, মধ্যমান, পঞ্জাবী
- ঠুম্‌রী অঙ্গ — দীপচন্দী, আদ্ধা ইত্যাদি।
- লঘু অঙ্গ — কাহারবা, দাদরা, ধূমালী, পোস্তা ইত্যাদি

এর মধ্যে অনেক তাল উভয় অঙ্গেই ব্যবহৃত হয়। যেমন— ঝাঁপতাল, আড়াচৌতাল ইত্যাদি খেয়াল ও ধ্রুপদ উভয়েই ব্যবহৃত হয়। তেমনি যৎ, আদ্ধা, দীপচন্দী এই তালগুলি যুগপৎ ঠুম্‌রী ও টপ্পা গানে বিশেষ ব্যবহৃত হয়। প্রসঙ্গত বলা যায় যে এই সকল তাল নির্দিষ্ট কোন গীত বা বাদ্যের প্রয়োজনে রচিত হয়নি। সকল তালই গীত বা বাদ্যের দ্বারা প্রকাশ করা যায়।

আর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব হল, হিন্দুস্থানী পদ্ধতিতে সংগীতের গতির একটি নির্দিষ্ট ভূমিকা রয়েছে এবং এই তির আধারেই তালগুলির রূপের প্রত্যক্ষ সংযোগ রয়েছে। তালের গতি কোন কারণে শ্লথ অথবা দ্রুত হয়ে গেলে এই লগুলির ছন্দ মাধুর্য নষ্ট হয়ে যায় এবং তখন সেই তালগুলি আর তাল থাকে না, কতকগুলি মাত্রায় রূপান্তরিত হয়। মন ঝাঁপতাল অথবা তেওড়াকে যদি অতি বিলম্বিত করা যায় তাহলে সেগুলি কতকগুলি মাত্রাসমষ্টি ছাড়া আর কিছুই ক না। যাইহোক, বর্তমানে কয়েকটি অতি প্রচলিত তালগুলির পরিচয় নিম্নে দেওয়া হোল।

॥ চৌতাল ॥

মাত্রা = ১২, তালি = ৪, ফাঁক = ২, পদ = সম, জাতি = চতুর্মাত্রিক, ছন্দ = ২।২।২।২।২।২

+		০		২		০		৩		৪	
ধা	ধা	দিন্	তা	কৎ	তাগে	দিন্	তা	তেটে	কতা	গদি	ঘেনে
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২

॥ ধামার ॥

(১ম মত)

মাত্রা = ১৪, তালি = ৩, ফাঁক = ২, পদ = বিসম, জাতি = মিশ্র, ছন্দ = ৩।২।২।৩।৪

+		।	০		২		০			৩			
ক	ধে	টে	ধে	টে	ধা	—	গ	দি	ন	দি	ন	তা	—
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪

॥ ধামার ॥

(২য় মত)

ছন্দ = ৫।২।৩।৪, তালি = ৩, ফাঁক = ১

+					২		০			৩			
ক	ধে	টে	ধে	টে	ধা	—	গ	দি	ন	দি	ন	তা	—
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪

॥ ঝাঁপতাল ॥

মাত্রা = ১০, তালি = ৩, ফাঁক = ১, পদ = বিষম, জাতি = মিশ্র, ছন্দ = ২।৩।২।৩

+		২			০		৩		
ধি	না	ধি	ধি	না	তি	না	ধি	ধি	না
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০

॥ তেওড়া ॥

মাত্রা = ৭, তালি = ৩, পদ = বিষম, জাতি = মিশ্র, ছন্দ = ৩।২।২

+			২		৩	
ধা	দেন্	তা	তেটে	কতা	গদি	ঘেনে
১	২	৩	৪	৫	৬	৭

॥ সুরফাঁকতাল ॥

(১ম মত)

মাত্রা = ১০, তালি = ৩, ফাঁক = ২, পদ = সম, জাতি = চতুর্মাত্রিক, ছন্দ = ২।২।২।২।২

+		০		২		৩		০	
ধা	ধা	দেন	তা	কেটে	ধা	তেটে	কতা	গদি	ঘেনে
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০

• লঘুঅঙ্গ :

॥ কাহারবা ॥

মাত্র = ৮, তালি = ১, ফাঁক = ১, পদ = সম, জাতি = চতুর্মাত্রিক, ছন্দ = ৪ | ৪

+				০			
ধা	গে	না	তি	না	ক	ধি	না
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮

॥ দাদরা ॥

মাত্র = ৬, তালি = ১, ফাঁক = ১, পদ = সম, জাতি = ত্রিমাত্রিক, ছন্দ = ৩ | ৩

+			০		
ধা	ধি	না	না	তি	না
১	২	৩	৪	৫	৬

॥ ধুমালী ॥

মাত্র = ৮, তালি = ৩, ফাঁক = ১, পদ = সম, জাতি = চতুর্মাত্রিক, ছন্দ = ২ | ২ | ২ | ২

+		২		০		৩	
ধা	ধিন্	ধা	তিন্	তাক্	ধিন্	ধাগে	তেরেকেটে
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮

॥ পোস্তা ॥

মাত্র = ৭, তালি = ২, পদ = বিষম, জাতি = মিশ্র, ছন্দ = ৩ | ৪

+			০			
তিন্	—	তাক্	ধিন্	—	ধা	গে
১	২	৩	৪	৫	৬	৭

হিন্দুস্থানী পদ্ধতিতে ক্রিয়া হিসাবে একমাত্র তাল ও ফাঁক ব্যবহৃত হয়, কিন্তু সমতা রক্ষার জন্য কোন ক্রিয়া ব্যবহৃত হয় নি, অতএব এখানে তাল ফাঁক ব্যতীত আরও তিনটি ক্রিয়ার উল্লেখ করা হচ্ছে; যথা— কাল, অর্ধতালি ও কোশী। এই তিনটি ক্রিয়ার প্রদর্শন রীতি এরূপ হবে: — যেমন কাল্ তালাঘাত বা ফাঁক প্রদর্শনের পরবর্তী ক্রিয়ার জন্য যে হস্ত উত্তোলন করা হয় তা হল কাল। অর্ধতালি বলতে বোঝায় তালাঘাতের পরবর্তী হস্তকে সম্পূর্ণ উত্তোলন না করে মাত্র হস্তের পশ্চাৎ ভাগ কিঞ্চিৎ উত্তোলন করে পুনরায় স্থাপিত করা। কোশী, -এর প্রদর্শন রীতি ফাঁকের অনুরূপ। উদাহরণের দ্বারা ক্রিয়াগুলির চিহ্ন হবে এরূপ, যেমন— তাল (/), ফাঁক (০), কাল (.), কোশী (∪), অর্ধতালি (*) মাত্রা অভ্যাসকালে ক্রিয়াগুলির ব্যবহার।

হিন্দুস্থানী তাল পদ্ধতি যেহেতু অভিজাত দেশীতাল, সেহেতু এই তাল পদ্ধতিতে একদিকে যেমন থাকবে দেশীতালের লক্ষণ, তেমনি থাকা উচিত অভিজাত বা গান্ধর্ব তালের কিছু বৈশিষ্ট্য। সংগীতে যদি বৈজ্ঞানিক বিষয়গুলির বিধি উপেক্ষা করা যায়, তাহলে অবশ্যই তা অভিজাত সংগীতের পর্যায়ভুক্ত হ'তে পারে না।